এই লেখাটি "দি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট" এর ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

শুচিবায়ু বা বাতিক বৈকল্য; জানতে চাই কী করণীয়!

সাদিয়া শারমিন, নাজমা খাতুন
চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী (প্রশিক্ষণরত)

'শুচিবায়ু' শব্দটির সঙ্গে আমরা কমবেশী সবাই পরিচিত। সাধারণত: ব্যাপারটিকে স্বভাবসুলভ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বা খুঁতখুঁতে স্বভাব হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। তবে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানে বা চিকিৎসা শাস্ত্রে এই স্বভাবের তীব্রতর মাত্রাকে একটি মানসিক সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হয়, যা অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডার বা সংক্ষেপে 'ওসিডি' নামে পরিচিত।

অবসেশন বলতে এমন সব চিন্তা, ধারণা বা গতিরূপকে বোঝায় যা থেকে ব্যক্তি নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। মনের তীব্র প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি নিজেই বুঝতে পারে তার চিন্তাভাবনাগুলো অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয়। এটা অনেক ধরনের হতে পারে, যেমন– নিজেকে অপবিত্র ও অশ্লীল ভাবা, নিজের অথবা অপরের বিপজ্জনক কিছু করে ফেলার মত তাগিদ অনুভব করা ইত্যাদি। আবার কারো ভেতরে 'আমি পৃথিবীতে কেন আসলাম'; 'পৃথিবী কিভাবে সৃষ্টি হল' এ জাতীয় প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে পাকে। ব্যক্তি এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায়না বলে তার মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তি তৈরী হতে থাকে এবং আরো বেশী সময় ধরে চিন্তা করতে থাকে।

অন্যদিকে কমপালশন বলতে বোঝায়, কোন কাজ বারবার করা; যা ব্যক্তির মধ্যে বিতৃষ্ণা তৈরী করে। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পার করা পর্যন্ত ব্যক্তি স্বস্তি খুঁজে পায় না। যেমন অনেকে বারবার হাত ধোয়, তালা ঠিকমত বন্ধ হয়েছে কিনা তা বারবার করে দেখে ইত্যাদি। কিছু কিছু কমপালশন ব্যক্তি মনে মনেও করতে পারে। যেমন– একই সংখ্যা বার বার গুণতে থাকা, কোন সুনির্দিষ্ট দোয়া-দরূদ পাঠ করা ইত্যাদি। এই বাধ্যকতাধর্মী কাজ অবসেশন থেকেও তৈরী হতে পারে অথবা সরাসরি কোন দুশ্চিন্তাগ্রস্থ অবস্থা, দায়িত্ববোধ অথবা চাপমূলক পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত হতে পারে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো ব্যক্তি সর্বদা একটি চক্রের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। যা নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে সহজেই অনুমেয় ঃ

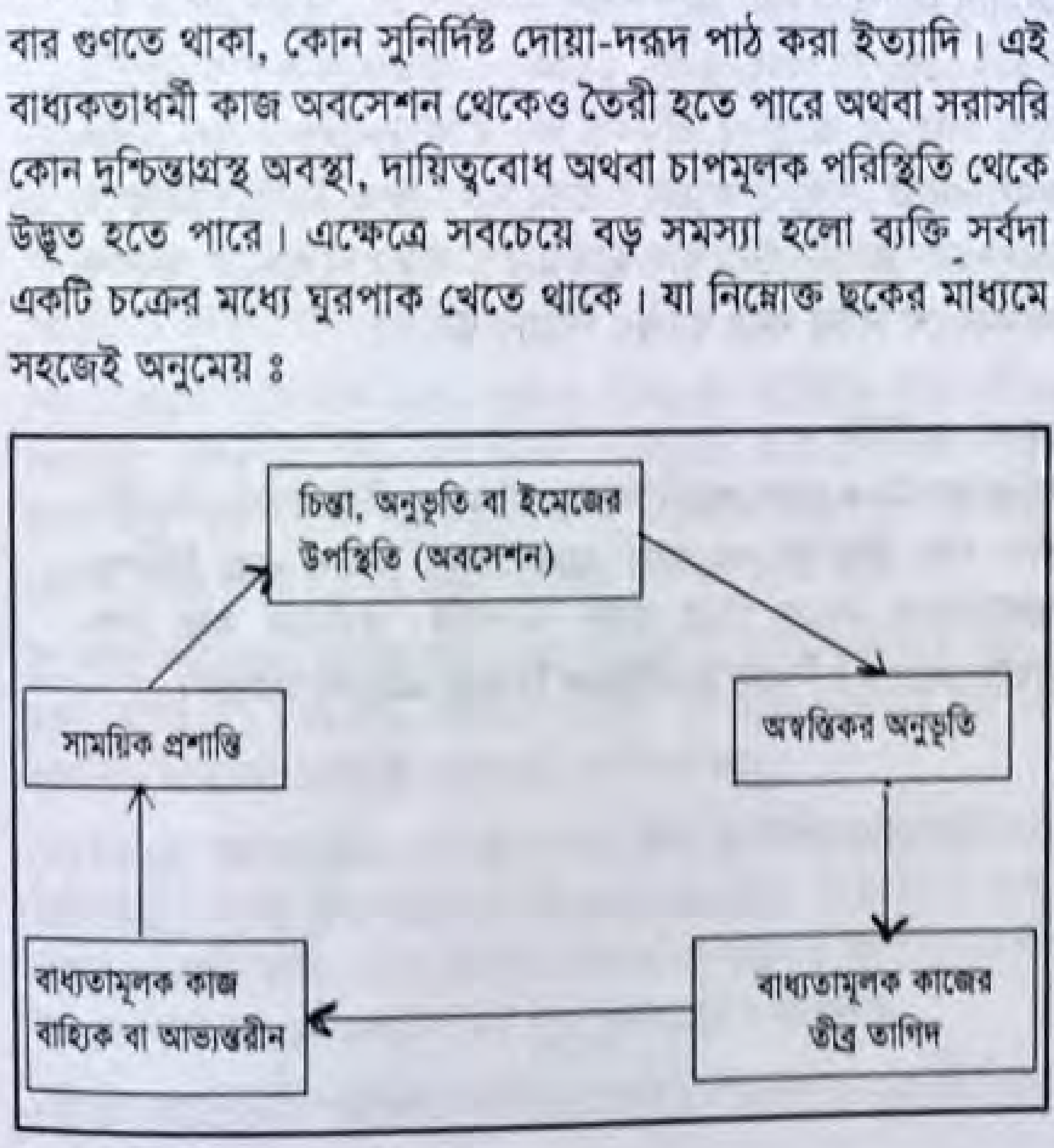
চিন্তা, অনুভূতি বা ইমেজের উপস্থিতি (অবসেশন)
অস্বস্তিকর অনুভূতি
বাধ্যতামূলক কাজের তীব্র তাগিদ
বাধ্যতামূলক কাজ বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীন
সাময়িক প্রশান্তি

সাধারণ মাত্রার এসব চিন্তা বা কাজ কোন মানসিক রোগ নয়। এটি স্বাভাবিক চিন্তা বা কাজের অতিরঞ্জিত রূপ, যা কমবেশী প্রায় সবার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। তবে যাদের ক্ষেত্রে এ সমস্যা এতই তীব্র যে, এটা তাদের দৈনন্দিন জীবনকে অসহনীয় এবং বিরক্তিকর করে তোলে, তাদের ক্ষেত্রেই কেবল এটাকে ডিসঅর্ডার বলা যাবে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩% এই সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে থাকে (APA, 2000)।

পাঠকদের উদ্দেশ্যে দু'একটি উদাহরণ দেওয়া হলো যাতে করে সমস্যাটি সম্পর্কে ধারণা নেওয়া সহজতর হয়।

উদাহরণ-১ ঃ ২৩ বছর বয়সের একজন মেয়ে এসে বললেন, তিনি তার বাসায় পরা জামা-কাপড়ে হাত রাখতে নোংরাবোধ করেন। টিস্যু পেপার বা কাগজ দিয়ে রিমোট ধরেন। পানির টেপ হাত দিয়ে ধরার আগে কয়েকবার পানি দিয়ে ধুয়ে নেন। প্রাকৃতিক কাজকর্ম সারার পর অনেক সময় নিয়ে সাবান দিয়ে হাত ধুতে থাকেন। আর ঘরের দরজা জানালা, তালা চাবি এসব জিনিস পারতপক্ষে না ধরার চেষ্টা করেন। এর ফলে তিনি তার স্বাভাবিক কাজকর্ম সময়মত করতে পারছেন না। পরিবারের সদস্যরা তার উপর রেগে যাচ্ছেন। সাবানের পানিতে হাত দুটোর চামড়া খসখসে হয়ে গেছে।

উদাহরণ-২ ঃ ৪০ বছর বয়সের একজন চাকুরীজীবি মহিলা। স্বভাবত: তিনি খুবই ধার্মিক। প্রতিটি কাজেই ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসরণ করেন। কিছু চাপমূলক পরিস্থিতি মোকাবেলা করার পর তিনি মনে করতে লাগলেন আল্লাহর প্রতি তার বিশ্বাস কমে গেছে। যখন কোরআন পড়তে যান তখন মনে হয় কোরআন শরীফে তার পা লেগে যাচ্ছে। ক্বাবা শরীফের কোন ছবি দেখলে মনে হয় তিনি পা লাগিয়ে দিচ্ছেন। বাস্তবে তিনি তার কিছুই করছেন না। কিন্তু তার এই মনে হওয়া চিন্তার কারণে দিনে দিনে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছেন। তার মধ্যে মৃত্যুভীতি কাজ করছে। তিনি নিজেকে পাপী মনে করছেন এবং বেশী বেশী করে দরূদ শরীফ পাঠ করেন যেন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন।

উপরের দুটো উদাহরণ দু'রকম সমস্যা নির্দেশ করছে। প্রথম উদাহরণে হাত ধোয়ার জন্য ব্যক্তি একধরনের বাধ্যবাধকতা অনুভব করছেন এবং হাত না ধোয়া পর্যন্ত অস্বস্তিতে ভুগছেন। যদিও তিনি সচেতনভাবেই বুঝতে পারছেন কোন একটা জিনিস ধরার পর ৫/৬ বার সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার প্রয়োজন নেই, তথাপি তিনি সাময়িক প্রশান্তির জন্য কাজটি করে যাচ্ছেন এবং সমস্যাটিও দিন দিন বেড়ে চলছে। দ্বিতীয় উদাহরণে আপাত: দৃষ্টিতে ব্যক্তি কোন কাজ করছেন না কিন্তু ভেতরে ভেতরে তিনি দরূদ শরীফ পাঠ করছেন, সাবধানে থাকছেন যেন পা লাগার কোন সম্ভাবনা না থাকে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছেন। এসব বাড়তি

কাজ তার দৈনন্দিন রুটিনকে বাধাগ্রস্থ করছে। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে দেরী না করে বরং উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থার শরণাপন্ন হওয়াই উচিত।

কারা কিভাবে দিয়ে থাকেন এর চিকিৎসা?

সাধারণত: মনোচিকিৎসক (Psychiatrist) এবং চিকিৎসামনোবিজ্ঞানী (Clinical Psychologist) যৌথভাবে এর চিকিৎসা প্রদান করেন। এই চিকিৎসা প্রধানত: দুই ধরনের। যথা–

ক) জৈবিক চিকিৎসা (Biological treatment)

খ) মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা (Psychological treatment).

ক) জৈবিক চিকিৎসা ঃ

জৈবিক চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে মনে করা হয় ব্যক্তির মস্তিষ্কে জৈব রাসায়নিক পদার্থ তথা সেরোটনিন এর ভারসাম্যহীনতার ফলে এই ধরনের সমস্যা তৈরী হয়। এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে মনোচিকিৎসকরা ঔষধ প্রদান করে থাকেন।

> এটি স্বাভাবিক চিন্তা বা কাজের অতিরঞ্জিত রূপ, যা কমবেশী প্রায় সবার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। তবে যাদের ক্ষেত্রে এ সমস্যা এতই তীব্র যে, এটা তাদের দৈনন্দিন জীবনকে অসহনীয় এবং বিরক্তিকর করে তোলে, তাদের ক্ষেত্রেই কেবল এটাকে ডিসঅর্ডার বলা যাবে।

খ) মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ঃ

ওসিডি চিকিৎসার জন্য কয়েক ধরনের মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে।। যেমন–

i) মনোসমীক্ষা (Psychoanalytic)

ii) আচরণগত চিকিৎসা (Behaviour therapy)

iii) জ্ঞানীয় আচরণগত চিকিৎসা (cognitive Behaviour tharapy)

তবে আমাদের দেশে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীগণ আচরণগত এবং জ্ঞানীয় আচরণগত চিকিৎসা পদ্ধতিই বেশী ব্যবহার করে থাকেন।

আচরণগত এবং জ্ঞানীয় আচরণগত চিকিৎসা ঃ

যেহেতু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তির সমস্যা থাকে আচরণগত, যেমন– বারবার হাত ধোয়া, কোন কাজ বার বার করা ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে আচরণের পরিবর্তন আনা জরুরী হয়ে পড়ে। আবার ব্যক্তির বাধ্যতাধর্মী আচরণ তার কোন না কোন চিন্তার ফলে হয়ে থাকে। ফলে চিন্তার ধরনের কিছু পরিবর্তন দরকার হয়। চিন্তা বা আচরণ যেক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনা হোক না কেন চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রথমত: তার সমস্যার উৎপত্তি এবং সমস্যা বজায় থাকবার কারণ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা দিয়ে থাকেন। এধরনের সমস্যা যে ব্যক্তির একার নয় সে সম্পর্কে তাকে অবহিত করা হয়। এর ফলে ব্যক্তি কিছুটা হালকা অনুভব করেন। পরবর্তীতে যেসব ঘটনা বা যেসব বিষয়ের উপস্থিতিতে ব্যক্তির মধ্যে চিন্তা বা কাজ করার বাধ্যবাধকতা তৈরী হয় সেসব বিষয়ের একটি তালিকা তৈরী করা হয়। কম অস্বস্তি তৈরী করে এমন বিষয়গুলোকে তালিকার শুরুতে রাখা হয়। এবং ব্যক্তিকে শেখানো হয় বার বার চিন্তা না করে কিংবা কাজ না করেও কিভাবে অস্বস্তির মাত্রা দূর করা যায়। এভাবে ধীরে ধীরে ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ মাত্রায় অস্বস্তি উদ্রেককারী পরিস্থিতির মুখোমুখি করা হয় এবং রিলাক্সেশন বা অন্যান্য কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে অস্বস্তি কমানোর চেষ্টা করা হয়। যদিও এ পদ্ধতি ব্যক্তির জন্য কষ্টকর, তথাপি তা দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা লাঘবের জন্য অত্যন্ত কার্যকর।

তবে যে কোন মানসিক সমস্যা সমাধানের মত 'ওসিডি'র ফলপ্রসূ চিকিৎসার জন্য ঔষধ এবং সাইকোথেরাপি পাশাপাশি প্রয়োগ করা ভাল। যদি সমস্যা অল্পমাত্রায় হয় সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বা সাইকোথেরাপির মাধ্যমে ভাল ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। তবে এই সমস্যা যদি গুরুতর হয় তবে তাকে অবশ্যই ঔষধ খেতে হবে এবং সেই সঙ্গে সাইকোথেরাপি নিতে হবে।

যৌথ চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে একক চিকিৎসা ব্যবস্থার তুলনা করে দেখা গেছে যে, যৌথ চিকিৎসা ব্যবস্থা তথা আচরণগত চিকিৎসা ও ঔষধ একত্রে প্রয়োগ করলে তা যে কোন একক চিকিৎসার তুলনায় অধিক কার্যকর হয়, তথা ৮০-৯০% এর মত (কট্রেক্স, মেলোর্ড, বাউভার্ড, ও তার সহযোগী, ১৯৯০)। এছাড়ও যৌথ চিকিৎসায় দেখা গেছে যে, জ্ঞানীয় আচরণগত চিকিৎসার সঙ্গে ঔষধের চিকিৎসা একসঙ্গে প্রয়োগ করলে তা যেকোন একক চিকিৎসার তুলনায় আরও অনেক বেশি ফলপ্রসূ হয়ে থাকে, অর্থাৎ ৯৫% এর উপরে (জেনিক এবং রাউচ, ১৯৯৪)। আরও অনেক গবেষণায় দেখা গেছে যে, আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে ৭০-৮০% অবসেসিভ কমপালসিভ রোগীরা কয়েক মাসের মধ্যে দ্রুত উন্নতি লাভ করে এবং সারা জীবনের জন্য ভাল হয়ে যায়। তবে ভাল হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে নির্ভর করে ব্যক্তির নিজের উপর।

লেখক পরিচিতি

সাদিয়া শারমিন ও নাজমা খাতুন উভয়ই প্রশিক্ষণরত চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে মনোবিজ্ঞানে অনার্স এবং চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানে এমএস ডিগ্রী অর্জন করেছেন। বর্তমানে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগে এমফিল করছেন।